ক্লিও

(দেওয়াল পত্রিকা, ডিজিটাল)

"উনিশ শতকের ভারতে উপজাতি বিদ্রোহের একটি চিত্র"

অষ্টাদশ সংখ্যা

২০২১

ইতিহাস বিভাগ

রানীগঞ্জ গার্লস্ কলেজ

সম্পাদকীয়

প্রথমে সকলকে জানাই আগত শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সামনেই দূর্গাপূজা, তাই আমাদের সবার মনের মধ্যে একটা অন্য অনুভূতি জেগে উঠেছে যেটা অনুভব করে আমরা সবাই এক দারুণ খুশিতে মেতে উঠেছি । আর সেই খুশি ও আনন্দ সবাই যাতে আমরা সবার সাথে ভাগ করে নিতে পারি , সেই প্রচেষ্টা আমাদের সবসময়,সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র একনিষ্ঠ হয়ে সফলতার শীর্ষে পৌঁছে যাবার, এই অকুন্ঠ প্রয়াস আমরা অবশ্যই চালিয়ে যাব।

যেজন্য আজকের এই প্রতিবেদন লেখার সুযোগ আমি পেয়েছি এবং নিজেকে ধন্য মনে করছি , রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজের ইতিহাস বিভাগের পরিকল্পনায় এবং সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক বছর যে দেওয়াল পত্রিকা "ক্লিও" প্রকাশিত হয় এই বছর সে দেয়াল পত্রিকাটি আমরা করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ডিজিটাল আকারে প্রকাশ করছি। রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজের ইতিহাস বিভাগের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ আজ এই দেওয়াল পত্রিকা "ক্লিও" ১৮ তম বছরে পদার্পণ করেছে এই জন্য আমরা অবশ্যই আন্তরিকভাবে গর্বিত।

বিশেষভাবে সকলকে অবগত করছি, আমাদের এই দেওয়াল পত্রিকাটির মূল বিষয়বস্তু হলো উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শাসকদের অকথ্য অত্যাচার এর বিরুদ্ধে উপজাতিদের প্রতিবাদী বিদ্রোহ।

দেওয়াল পত্রিকাটি লিখিত আকারে বোর্ডে প্রকাশ করতে না পেরে আমরা যেমন হয়তো অল্প দুঃখিত, অন্যদিকে মহামারীর কথা চিন্তা করে আমাদের এই সুস্থ সিদ্ধান্তকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হয়। কোভিড-১৯ (করোনা) আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে অনেককে অজান্তেই ছিনিয়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে, সেই সব মানুষদের আত্মার শান্তি কামনা করি । আবার একটা কথা না লিখে পারছিনা, করোনা যেমন আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে তেমনি আবার এই করোনা পরিস্থিতিতে অনেক কিছু আমরা শিখতে পেরেছি। তাই সবার কাছে অনুরোধ এই শিক্ষাটা আমরা যেন না ভুলি।

সর্বশেষ বিশেষ আন্তরিকতার সাথে জানাই যে, এই দেওয়াল পত্রিকাটি ডিজিটাল আকারে প্রকাশ করার জন্য যারা আমাদের তাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিঃস্বার্থ প্রেরণা জুগিয়েছেন তাদের সেই শিক্ষা আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। আমাদের পূজনীয় অধ্যক্ষা মহাশয়া, যাঁর নিরন্তর প্রেরণা ও সহযোগীতা ছাড়া আমরা এই কাজ করতে পারতাম না, তাঁকে ও বিভাগীয় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সুবর্ণা মুখার্জী, (তৃতীয় বর্ষ), সম্পাদক
ইতিহাস বিভাগ, রানীগঞ্জ গার্লস্ কলেজ। ১৪.০৯.২০২১

চুয়াড় বিদ্রোহ(১৭৯৮-৯৯)

মেদিনীপুর বাঁকুড়া ধলভূম অঞ্চল নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার জঙ্গলমহল অঞ্চল গঠিত হয়েছিল। জঙ্গলমহলের অধিকাংশ কৃষিজীবীকে বলা হত চুয়াড়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি জঙ্গলমহল এলাকায় উচ্চ হারে রাজস্ব ধার্য করে। যার প্রতিবাদে চুয়াড়রা বিদ্রোহ শুরু করে। চুয়াড় বিদ্রোহ দুটি পর্বে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব ১৭৬৪-১৭৬৯, দ্বিতীয় পর্ব ১৭৯৮-৯৯। প্রথম পর্বের চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ সিং। আর দ্বিতীয়বার চুয়াড় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন অচল সিং, দুর্জন সিংহ, মাধব সিং। এইসময় চুয়াড় বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের চরিত্র ধারন করে। দ্বিতীয়বার চুয়াড় বিদ্রোহে ওড়িশা থেকে পাইক বিদ্রোহীরা সংযোগ স্থাপন করেছিল। এই কারণে চুয়াড় বিদ্রোহ অন্য মাত্রা পায় । এই বিদ্রোহ দুর্জন সিং - মাধব সিং-এর নেতৃত্বে গেরিলা কায়দায় পরিচালিত হয়। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ বিভিন্ন এলাকায় কোম্পানির তাঁবেদার জমিদার ও তাদের নায়েবদের ওপর হত্যালীলা চালায়। মূলতঃ এই বিদ্রোহ অবদমিত হয়।

হো বিদ্রোহ (১৮২০-২১)

হো উপজাতি ছিল মূলত ছোটনাগপুর ও সিংভূম অঞ্চলের বাসিন্দা। এরা কোল উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২০ সালে পোড়াহাটের রাজা ব্রিটিশ শাসকের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। এবং বিপুল পরিমাণে করের বোঝা সামলানোর জন্য হো উপজাতিদের অঞ্চল রাজ্যের অংশ বলে দাবি করেন। ব্রিটিশ শাসকরা রাজার এই দাবি মেনে নেন। কিন্তু রাজা বলপূর্বক উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করলে হো সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে ক্ষোভে ফেটে পড়ে ও বিদ্রোহ শুরু করে। ব্রিটিশরা সাময়িকভাবে পিছু হটলেও ১৮২১ সালে আবার কামানসহ উপস্থিত হয়। হো বিদ্রোহীরা প্রস্তুত থাকলেও ব্রিটিশদের নতুন কৌশলের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

হো বিদ্রোহের অবসান ঘটলেও তারা পোড়াহাটের রাজাকে 'লাঙল কর' দিতে অস্বীকার করে, রাজার কর্মচারীদের হত্যা করে নিজেদের অঞ্চলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ১৫ বছর ধরে রাজার পাইকদের সাথে হো-চাষীদের যুদ্ধ চলেছিল।

কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন এক সময় কোল জাতি(অস্ট্রোলয়েড) ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং বর্তমান ঝাড়খন্ডের ছোটনাগপুর ও রাঁচি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ছোটনাগপুরের দু'হাজার বর্গমাইল ব্যাপী 'কোলহান অঞ্চল'ই ছিল কোলদের প্রধান বাসস্থান। কোলজাতির সমাজের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তি বা সর্দারদের নাম ছিল মুন্ডা। এইজন্য কোলরা মুন্ডা নামেও পরিচিত। প্রথম বসতি স্থাপনকারী (খুন্ত কাট্টিদার) হিসাবে কোলরা প্রাচীন কাল থেকে যে সকল অধিকার ভোগ করে আসছিল তার উপর কেউ কোনদিন হস্তক্ষেপ করেনি। অনেকের মতে কোলরাই সর্বপ্রথম ভারতে সমানাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৃটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত তাদের অধিকার অটুট ছিল। কালক্রমে কোলদের মধ্যেও রাজা ও জমিদারগোষ্ঠির জন্ম হয়েছে, কিন্তু তারা কখনই কোলদের সমাজ-ব্যবস্থা ও বিশেষ অধিকারে হস্তক্ষেপ করেনি।

বৃটিশ শাসনের সূচনাকাল থেকেই ছোটনাগপুর ও রাঁচি জেলার অধিবাসী কোল চাষীদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। প্রথমতঃ বৃটিশ শাসকগন এই অঞ্চলে মুদ্রা অর্থনীতির প্রবর্তন করে কোলদের প্রাচীন অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়। এদের সাথে সাথে প্রবেশ ঘটে হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রভৃতি জাতির মহাজনদের (কোলদের ভাষায় 'দিকু') যারা কোলচাষীদের সমস্ত অধিকার হরণ করে তাদের উপর ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করে এবং বিনা মজুরিতে কাজ করিয়ে ক্রীতদাসে পরিনত হতে বাধ্য করে। ফলে শুরু হয় প্রায় শতাব্দী ব্যাপী কোল উপজাতি গোষ্ঠীর এক অসম সংগ্রামের ইতিহাস।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫)

সাঁওতাল বিদ্রোহ বা 'হুল' বর্তমান ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ১৮৫৫ সালের এক তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ছিল। ১৮৫৬ সালে বৃটিশ শক্তি সমস্ত নিষ্ঠুরতাসহ এই বিদ্রোহকে দমন না করা পর্যন্ত সাঁওতাল উপজাতি এই অসম লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল।

বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বৃটিশরা যে জমিদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, তার ফলে বৃটিশ সশাসক এবং জমিদাররা সাঁওতাল উপজাতির ঐতিহ্যগত জমি তাদের বলে দাবি করে। শুরু হয় নির্মম শোষন। অস্বাভাবিক সুদের হার বৃদ্ধি করে তাদের ঋণের জালে আটকে রাখার বন্দোবস্ত হয়। জোর করে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। জমি-হারা সাঁওতালরা 'বাঁধা শ্রমিক'-এ পরিণত হয়। পদে পদে ব্যবসায়ী-মহাজনদের ফাঁদ পাতা থাকে। এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকারও জমিদার-ব্যবসায়ী-শাহুকারদের পক্ষ অবলম্বন করে।

এর ফলে ১৮৫৪ সালে লছিমপুরের বীর সিং প্রথম বিদ্রোহ ঘোষনা করে। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে বিদ্রোহ দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছায় যখন সিধু-কানহু দুইভাই প্রায় ১০,০০০ সাঁওতালকে সংগঠিত করে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। তারা মহাজন ও কোম্পানীর এজেন্টদের হত্যা করে। বিদ্রোহের গভীরতা ও বিস্তার বৃটিশ শাসককেও চিন্তায় ফেলে ছিল। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগঠিত শক্তি ও আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর-ধণুক-টাঙ্গি-বল্লম নিয়ে জীবনপণ লড়াই করেও সাঁওতালরা পরাজিত হয়। সিধু-কানহু সহ প্রায় কুড়ি হাজার সাঁওতালকে বৃটিশরা হত্যা করে। বৃটিশ শক্তি জয়লাভ করলেও বুঝতে পারে এই ভাবে আর দীর্ঘদিন ভারতের উপজাতিদের শোষণ করা যাবে না।

খেরওয়ার আন্দোলন

খেরওয়ার ছিল সাঁওতালদের আদি নাম। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বিরুদ্ধে সাঁওতালরা সংগঠিত হয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহ করেছিল। ক্রমে তা বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদনীপুর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৭০ সালে সাঁওতালরা পুনরায় বিদ্রোহ করে যা খেরওয়ার বিদ্রোহ নামে পরিচিত। খেরওয়ার আন্দোলন ছিল সাঁওতালদের একটি ধর্মীয় আন্দোলন। যদিও ধর্মীয় ও সামজিক আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও এটি একটি কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়। পুরাতন রাজনীতি, আচার ব্যবহার ছেড়ে হিন্দুদের অনুকরণে নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরি ও শুদ্ধ জীবনচর্চা গড়ে তোলার লক্ষ্যে খেরওয়ার (সাঁওতাল) -রা ভগীরথ মাঝির নেতৃত্বে খেরওয়ার আন্দোলনের সূচনা ঘটায়। স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই আন্দোলন (১৮৭০-১৮৮২খ্রীঃ)। এছাড়াও এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি।

মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৫-১৯০০)

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী বা উপজাতীয়দের মধ্যে ১৮৯৯-১৯০০ মুন্ডা বিদ্রোহ অন্যতম। মুন্ডাদের ভাষায় এই বিদ্রোহ উলগুলান নামে পরিচিত। উলগুলান কথার অর্থ হল বিরাট তোলপাড় বা ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা। মুন্ডারা স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে মুন্ডাদের স্বাধীনতা প্রায় ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, দিকু বা বহিরাগতদের মুন্ডা সমাজে অনুপ্রবেশ, উৎপীড়ন, ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার মুন্ডাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্ব দেন বিরসা মুন্ডা। বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে দু'টি পর্যায়ে মুন্ডা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। প্রথমটি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই আগস্ট মাসে, এবং দ্বিতীয়টি ১৮৯৯-১৯০০ খ্রিস্টাব্দে।

তমোর বিদ্রোহ

১৭৮৯ সাল থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে তমোর উপজাতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জঙ্গলমহল সংলগ্ন অঞ্চল মেদিনীপুর , কোয়েলপুর, ঘাটশিলা ,ঝালদা, সিলির উপজাতিদের তারা যুক্ত করেছিল। তারা সরকারের ভুল শ্রেণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তমোর বিদ্রোহের নেতা ছিলেন উপজাতিভুক্ত ভোলানাথ সহায়। ১৮৩২ সালে বিদ্রোহের সূচনা বার্তা হিসেবে যুদ্ধের তীর সমস্ত অঞ্চলে বিতরিত হয়। ওরাও, মুন্ডা, হো, কোল উপজাতিগুলির আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তারা এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যোগ দিয়েছিল। মানভূম রাজ পরিবারের সদস্য গঙ্গানারায়ণ সিংহ ছিলেন এদের নেতা। এই অঞ্চলের সমস্ত গ্রামের উপজাতিরা দিকু-দের হত্যা করে, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং ধ্বংস করে। কিন্তু ১৮৩২ থেকে ১৮৩৩ সাল নাগাদ সরকার এই আন্দোলনকে নির্মমভাবে স্তব্ধ করে দেয় এবং হো অঞ্চল সরকারি এস্টেট হিসাবে সংযুক্ত হয়।

ভীল বিদ্রোহ

ভারতবর্ষের একটি প্রাচীনতম উপজাতি সম্প্রদায় হল ভীল। খান্দেশের পার্বত্য অঞ্চলে ভীল জনগোষ্ঠীর মানুষ তাদের বসতি স্থাপন করে। এরা স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা খান্দেশ অঞ্চলটির অধিকার করে নেয়। বহিরাগতদের অনুপ্রবেশে ভীলদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে এই অঞ্চলে প্রবর্তিত সরকারি নিয়ম কানুন ও কর্তৃত্ব মানতে না পেরে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে ভীল সম্প্রদায় উত্তরের সাতপুরা অঞ্চলে ও দক্ষিণের সাতনাম, অজন্তা অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু করে। এই অভ্যুত্থান ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর দ্বারা ধ্বংস করা হয়। এরপর ১৮২৫ সালে সেবা রামের নেতৃত্বে ভীলরা পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ১৮৩১ সাল পর্যন্ত এক অস্থির পরিস্থিতি চলতে থাকে। ব্রিটিশরা এই অভ্যুত্থানগুলি দমিত করলেও নির্মূলে উৎখাত করতে পারেনি। ১৮৩৬ সালে এবং ১৮৪৫ সালে ভাংগ্রিয়া-র নেতৃত্বে সুদখোর মারোয়াড়ী মহাজনদের বিরুদ্ধে ভীলরা পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের ফলস্বরূপ শোষক মহাজন শ্রেণী রাজস্থানের গ্রামাঞ্চল থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে, ১৯১৩ সাল নাগাদ ভীলদের শুদ্ধি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন গোবিন্দ গুরু। ভীলদের এই আন্দোলন গুজরাটের পঞ্চমহল বা পাঁচমহলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নাইকদা বিদ্রোহ

দক্ষিণ রাজস্থান ও উত্তর-পশ্চিম গুজরাটের পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চল ছিল উপজাতি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। ১৮৬৮ সালে গুজরাটের পাঁচমহল অঞ্চলের নায়েকদা উপজাতিভুক্ত মানুষরা থানার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এই সব আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রূপসিং গোবর নামে একজন নেতা, যিনি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আর এক জন নেতা হলেন জোরিয়া, যিনি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলে দাবি করতেন। এই আন্দোলন আসলে 'পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন'-এর অংশ বিশেষ।

কোলি বিদ্রোহ

বোম্বাই প্রদেশের পুনা ও থানে জেলার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে কোলি উপজাতির বসবাস। ১৮২৯ সালে আহ্‌ম্মদনগর জেলায় বসবাসকারী কোলি জনগোষ্ঠী বৃটিশ শাসকদের বিরোধিতা করে। কিন্তু একটি বড় সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহকে দ্রুত দমন করে। বিদ্রোহ দমিত হলেও বিদ্রোহের বীজ রোপিত হয়ে যায়। ১৮৪৪-৪৬ সালে স্থানীয় কোলি নেতা বৃটিশদের অস্বীকার করে সাফল্যের সঙ্গে দু'বছর স্বাধীনতা ভোগ করেছিল।

আবার অন্যত্র অন্য এক পরিবেশে এই জনগোষ্ঠী অন্য ধরনের সংগ্রাম পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে বিনা যুদ্ধে নতি স্বীকার করেনি। এই দরিদ্র, নিরীহ ও নিরক্ষর পার্বত্য উপজাতি মারোয়াড়ী মহাজনগোষ্ঠীর শোষনের শিকারে পরিনত হয়। প্রথমে অর্থের লোভ দেখিয়ে ঋণ গ্রহনে অভ্যস্ত করে তোলে, তারপর ঋণ দায়গ্রস্ত এই মানুষজনকে বাধ্য করে তাদের জমিজমা মহাজনদের হাতে তুলে দিতে। কোলিরা জমিজমা হারিয়ে জীবন ধারনের জন্য দস্যুবৃত্তি গ্রহন করে। নিরীহ উপজাতিটি পরিণত হয় দুর্ধর্ষ দস্যুতে। তবে তাদের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মারোয়াড়ী মহাজনরা।

মহাজনদের কবল থেকে জমিজমা উদ্ধারের জন্য কোলিরা মহাজনদের উপর প্রায়ই আক্রমন চালাত। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে কোলিরা বিভিন্ন মহাজনদের উপর প্রায় আড়াই শো বার আক্রমন চালিয়েছিল।

কুকা বিদ্রোহ

১৮৪০ সালে ভগৎ জওহার মাল পশ্চিম পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। তিনি 'সাইন সাহেব' নামেও অনুগামীদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। প্রথম দিকে এটি একটি ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ আন্দোলন ছিল। কিন্তু বৃটিশ ঔপনিবেশিকরা পাঞ্জাব অধিগ্রহণ করলে এই আন্দোলন ধর্মীয় প্রচার আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল জাতি প্রথার বিলোপ সাধন এবং শিখদের মধ্যে এই ধরণের যেকোন পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। এই অন্দোলনের মাধ্যমে তারা মাংস খাওয়া, মদ্যপান করা, কোন ধরনের নেশা করার বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রতিবাদ সংগঠিত করে এরগুলির অবসান ঘটানোর চেষ্টা করে। পাশাপাশি মহিলাদের তাদের নিঃসঙ্গতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করেছিল। এই ধরণের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

কোন্ড বা খোন্দ বিদ্রোহ

কোন্ড জনজাতি ভারতেরই একটি উপজাতি সম্প্রদায়। তামিলনাড়ু থেকে বাংলা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে কোন্ড উপজাতির মানুষজন বসবাস করত। স্বাধীনতা প্রিয় এই জনগোষ্ঠী ১৮৩৭ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। কোন্ড জনগোষ্ঠী ছাড়াও ঘুমসার, টানা কী মেডী, কালাহান্ডি এবং পাটনার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীও এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চক্রা বিসোই নামে এক যুবক রাজা। এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল সরকার দ্বারা নরবলি বা 'মারিহ' প্রথা রদ করার প্রচেষ্টা, যা উপজাতিদের কাছে তাদের ঐতিহ্যের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়। যদিও মূল কারণ ছিল, ব্রিটিশদের দ্বারা নিত্য নতুন কর আরোপ, আদিবাসী অঞ্চলে জমিদার ও শাহুকার (মহাজন)-দের প্রবেশ যা উপজাতিগোষ্ঠী মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

ব্রিটিশরা একটি ‘মারিয়া এজেন্সি’ গঠন করেছিল যার বিরুদ্ধে কোন্ডরা টাঙ্গী, তলোয়ার, তীর-ধনুক নিয়ে তাদের বাঁচার লড়াই শুরু করে। পরে 'সাভারস' ও 'রাধা কৃষ্ণ দন্ডসেনার' নেতৃত্বে স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী এই লড়াইয়ে শামিল হয় এবং কোন্ডদের সংগ্রাম কে শক্তিশালী করে তুলেছিল। কিন্তু ১৮৫৫ সালে চক্রা বিসোই হঠাৎ করে হারিয়ে গেলে আন্দোলন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

কোয়া বিদ্রোহ

১৮৭৯-৮০ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী অঞ্চলে কোয়া বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ওড়িশার মালকানগিরি জেলার কিছু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ এই এলাকা অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এর মূল কেন্দ্র ছিল চোডাওরম-এর রম্পা অঞ্চল। ১৮০৩, ১৮৪০, ১৮৪৫, ১৮৫৮, ১৮৬১ এবং ১৮৬২ সালে কোয়া উপজাতি এবং কোন্ডা সারা পার্বত্য যোদ্ধাদের ঊর্ধ্বতন প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৭৯-১৮৮০ সালে কোয়া জনজাতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তোম্মা সোরা। উপজাতি জনগোষ্ঠী যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছিল তা প্রতিফলিত হয়েছিল এই বিদ্রোহে। যার মধ্যে প্রধান ছিল জঙ্গলের উপর উপজাতিদের প্রথাগত অধিকারের বিলুপ্তিকরনের বিরোধিতা ,পুলিশি নির্যাতনে বিরোধিতা, মহাজনদের শোষণের বিরোধিতা, নতুন নতুন আইন বিধি যা গৃহ উৎপাদনে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তার বিরোধিতা। মালকানগিরি রাজা হিসেবে তোম্মা সোরা স্বীকৃত হন। এই আন্দোলন পায় ৫০০০ বর্গ মাইল অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের পুলিশ তোম্মা সোরাকে গুলি করে হত্যা করে। ১৮৮৬ সালে রাজা অনন্ত আইয়ারের নেতৃত্বে আবার অন্য একটি বিদ্রোহ গড়ে তোলে কোয়া উপজাতি। স্বাধীনতাপ্রেমী কোয়া জনজাতির বিদ্রোহ উনিশ শতক জুড়ে ভূস্বামী ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ছিল।

ভোক্তা আন্দোলন

উনিশ শতকে ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ভোক্তা আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৮সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত এই ` সর্দারী লড়াই ' বা ` মুক্তি লড়াই ' চলেছিল।এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ঘৃণ্য ভূস্বামীদের সরিয়ে জমির উপর আদিবাসীদের আদিম অধিকার পুনরুদ্ধার করা। এই লড়াই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল।১। - কৃষি পর্যায়, ২। - পুনরুদ্ধার পর্যায়, ৩। - রাজনৈতিক পর্যায়। জমি থেকে রায়তদের উৎখাত করা, খাজনার হার বৃদ্ধি, দরিদ্র রায়তদের উপর জমিদারদের প্রবল অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে উপজাতি-চাষীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৯০ সাল থেকে ভোক্তা আন্দোলন পুরোপুরি ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। কোন রকম সুশাসন ও সুবিচারের ব্যবস্থা না থাকায় এই উপজাতি গোষ্ঠী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং তাদের চিরাচরিত অস্ত্র, তীর-ধণুক হাতে তুলে নিয়েছিল। ১৮৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সর্দাররা জার্মান মিশনারী ও কন্ট্রাক্টরদের হত্যা করার যে পরিকল্পনা করেন তা তেমন কোনো সংগঠন না থাকার কারণে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পর বিরসা মুন্ডার মধ্যে তারা তাদের নতুন নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

ভূমিজ বিদ্রোহ

ভূমিজ হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড (বিশেষত বৃহত্তর সিংভূম জেলায়) রাজ্যে বসবাসকারী একটি আদিবাসী উপজাতি। এরা 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভূমিজ ভাষা/হড়কাজি ভাষায় কথা বলে। কোথাও কোথাও ভূমিজরা 'বাংলা' প্রভৃতি স্থানীয় ভাষাতেও কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড অঞ্চলে এই জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাস।

ভূমিজ শব্দের অর্থ 'ভূমিপুত্র'। ঝাড়খণ্ডে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত আদিবাসী উপজাতিগুলির একটি হল ভূমিজ। ভূমিজ কোলরা পদবী হিসেবে 'সিং' শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে ভূমিজদের প্রাধান্য দেখা যায়। যদিও সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে তারা সাঁওতাল ও বাউরিদের থেকে অনেক পিছনে। তারা মূলত কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করেন। প্রাচীনকালে সম্ভবত উত্তরে পঞ্চকোট অবধি এদের বসতি ছিল। বর্তমানে ধলভূম, বরাভূম, পাটকুম ও বাঘমুন্ডি এলাকাতেই ভূমিজরা বাস করেন।

ছোটোনাগপুর মালভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ভূমিজরা মুন্ডারি ভাষার সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ এখনও বজায় রেখেছেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের ভূমিজরা বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা রূপে গ্রহণ করেছে। ধলভূম অঞ্চলের ভূমিজরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ব্রিটিশ যুগে এবং তার কিছু আগেও অনেক ভূমিজ জমিদার হয়ে রাজা উপাধি গ্রহণ করেছিল। অন্যদের বলা হত সর্দার। সবাই যদিও সমাজে উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করতেন।

খাসি বিদ্রোহ

আসামের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী একটি উপজাতি গোষ্ঠী হল খাসি। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে খাসি উপজাতি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই শুরু করেছিল। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন খাসি প্রজাতন্ত্রের প্রধান তিরোট সিং। তিরোট সিং তার উপজাতি সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। যদিও ১৮৩৩ সালে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে উপজাতি সম্প্রদায়ের অসম যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

এরপর ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় খাসিরা পুনরায় উৎসাহিত হয়ে এক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এই অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ ছিল অতিরিক্ত করের চাপ। খাসিরা তাদের উপজাতি প্রধানের নেতৃত্বে কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটায়। নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা তীর-ধনুক হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের বিদ্রোহকে নির্মূলে ধ্বংস করে দেয়।

নাগা উপজাতির বিদ্রোহ

ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বাঞ্চলে জনজাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাগা উপজাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অঙ্গামি, অও, চাখেসাৎ, কোনায়ক, লোথা, চাং, সুমি, সাংতম প্রভৃতি নাগা উপজাতির উলেখযোগ্য জনগোষ্ঠী। ঊনবিংশ শতকে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পযন্ত বর্হিবিশ্বের সাথে নাগাদের কোনো ধরনের যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিল না। নাগা উপজাতি যে কোনো ধরনের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকতে পছন্দ করত। ব্রিটিশরা এক ধরনের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ধারণা পরিচিতির জন্ম দিয়েছিল যা নাগা গোষ্ঠীর কাছে নতুন ছিল। ১৮৩০ দশকে ব্রিটিশ শাসকদল নাগা পার্বত্য অঞ্চলে একটি বাহিনী প্রেরণ করে এবং ১৮৪৫ সালে নাগাদের প্রধানের সাথে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে । কিন্তু নাগারা এই চুক্তি লঙ্ঘন করে বারবার আসাম এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসক এই অঞ্চলে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করে এবং ১৮৫১ সালে এখানে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপনেও কিছু পরিমান ভিত্তি স্থাপনে সফল হয়। ১৮৭৮ সালে অঙ্গামী নাগারা ব্রিটিশ শিবির আক্রমণ করে। ব্রিটিশ সরকার এর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আক্রমণ পরিচালনা করে।বহু নাগাদের গ্রাম পুড়িয়ে দেয় এবং তাদের চিরতরে ধ্বংস করার জন্য নাগাদের হত্যা করে।এই অঞ্চল স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশদের অধিকার ভুক্ত হয়। এরই পাশাপাশি ঊনবিংশ শতকে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারীরা বহু নাগা গোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করতে সফল হয়েছিল।

জয়ন্তিয়া ও নোওগঙ অঞ্চলের বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে সংগঠিত মহাবিদ্রোহ আসামের উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকেও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। ১৮৬0 সালে ব্রিটিশ শাসকদলের বিরুদ্ধে আসামে দুটি বিদ্রোহ দেখা দেয়- একটি জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকায় এবং আরেকটি নোওগঙ জেলার ফুলাগুঁড়িতে। ১৮৩৫ সালে জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চলটি সিন্টেঙ্গ উপজাতির বাসভূমি। সিন্টেঙ্গরা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়, বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। নতুন শাসকগণ উপজাতীয় কৃষকদের ওপর একে একে শোষণমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে থাকে। যার প্রতিবাদে উপজাতীয় কৃষক গণবিদ্রোহে লিপ্ত হন।

জয়ন্তিয়া পার্বত্য উপজাতির বিদ্রোহের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ১৮৬১ সালে নোওগঙ উপজাতিরাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই অভ্যুত্থানের কারণ ছিল তাদের উৎপন্ন শস্য - ধান, পান, সুপারি প্রভৃতির ওপর বর্ধিত করের হার। এছাড়াও পপি থেকে আফিম উৎপন্ন হয় বলে ব্রিটিশ সরকার পপি চাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।পপি ছিল চাষীদের আয়ের অন্যতম উৎস। এই দু'এর ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। অবশেষে কৃষকগণ বিদ্রোহের পথে এই শোষণ- উৎপীড়ন বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অন্যান্য উপজাতি বিদ্রোহের মতো এই অভ্যুত্থান গুলিও নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে। স্বাধীনতাপ্রিয় উপজাতিগুলি ব্রিটিশ শাসকদের আধুনিক বাহিনী্র সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল।

পরিকল্পনা ও উপস্থাপনাঃ

ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সকল,

রানীগঞ্জ গার্লস্ কলেজ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

ড. ছবি দে, অধ্যক্ষা, রানীগঞ্জ গার্লস্ কলেজ
ও
বিভাগীয় সকল অধ্যাপক।